গুঁড়ো, ২০ গ্রাম এন-পি-কে সার মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত ভর্তি করতে হবে। এই সময় বিভিন্ন অনুখাদ্য ও হরমোন স্প্রে করা যেতে পারে। এছাড়া গাছে ফুলের কুঁড়ি বের হওয়ার আগে ৪ গ্রাম ফোরাস সালফেট প্রতি লিটার জলের সঙ্গে মিশিয়ে স্প্রে করে দিলে ফুলের গুণগত মান ভালো হয়। পাতায় উদ্ভিদ খাদ্য স্প্রে করার সময় প্রতি লিটার জলের মিশ্রণে ২ গ্রাম কাপড় কাচার সাবান গুলে নিলে স্প্রে মিশ্রণ পাতায় ভালোভাবে ছড়ায় এবং সহজে লেগে থাকে।

সেচ : গোলাপবাগানে যখন জল দেওয়া হবে তখন গাছের গোড়ার মাটি ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। গাছ রোপণের পর এবং মাটিতে সার প্রয়োগের পর অবশ্যই পর্যাপ্ত পরিমাণ জল দিয়ে সেচ দিতে হবে, মাটির নীচে ১০-১৫ সেমি গভীরতা পর্যন্ত সিক্ত হয়। কিন্তু গাছের গোড়ায় অতিরিক্ত জল বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়। পশ্চিমবঙ্গে সাধারণত গ্রীষ্মে সপ্তাহে এক বার, শীতে ২ সপ্তাহে ১ বার, কুঁড়ি ফোটার পর অল্প পরিমাণ ঘন ঘন সেচ দেওয়া হয়।

ফলন : বাজারজাত করার জন্য যখন ফুলের কুঁড়ির প্রথম পাপড়ি প্রস্ফুটিত হয় অর্থাৎ যখন পাপড়ি কুঁড়ি থেকে আলগা হতে শুরু সেই সময় তুলে নেওয়া প্রয়োজন। ঠিকমতো যত্ন, পরিচর্যা করা গাছ থেকে ৮০-২০০ কোটি ফুল প্রতি হেক্টরে পাওয়া সম্ভব।

পরবর্তী পরিচর্যা ও বিপণন : ফুলের জাত, ফুলের গঠন, রং, বাজারের গুরুত্ব ইত্যাদি ভেদে সময় নির্ধারণ করা। সাধারণত দেশীয় বাজারের জন্য ৫ ফলক ২টি পাতা সহ ৩০ সেমি লম্বা ডাল তোলা প্রয়োজন, যদিও বিদেশি বাজারে ৬০ - ৯০ সেমি বা ৪০ - ৫০ সেমি লম্বা ডাল দেখা যায়। ফুল তোলার উৎকৃষ্ট সময় সকালে সূর্য উঠার আগে অথবা বিকালে সূর্য ডোবার পর। বাজারজাত ফুল ঠান্ডা জায়গায় মজুত রাখা হয়। ফুল রাখার জন্য ব্যবহৃত পরিষ্কার জল ১০ মিনিট ফুটিয়ে তারপর ব্যবহার করলে ফুলের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। ফুলের ডাঁটাগুলি ভেঙে ১০-১২ টি ফুলের স্টিক খবরের কাগজ দিয়ে সাবধানে ৪-৫ বার জড়িয়ে রাবার বা সুতো দিয়ে বাঁধতে হবে। তাছাড়া জলে ভিজিয়ে কালো পলিথিন বা ভিজা চটে মুড়ে বাজারে পাঠানো যায়।

রোগ ও পোকার নিয়ন্ত্রণ :

রোগ :

ডাল শুকিয়ে যাওয়া (ডাইব্যাক Die Back) :

পশ্চিমবঙ্গে সমতল অঞ্চলের বেশির ভাগ জায়গায় গোলাপ চাষের মূল সমস্যা ডাল শুকিয়ে যাওয়া। গাছের ডালগুলি ডগা থেকে শুকোতে শুরু করে এবং নীচের দিকে নামতে থাকে। পুরো ডালটা, এমনকি গাছটাও শুকিয়ে মরে যায়। জমিতে অন্যগাছে রোগ ছড়িয়ে যায়। ডাল ছাঁটার সঙ্গে রোগের প্রকোপ অতি দ্রুত বেড়ে যায়।

প্রতিকারের জন্য যে ডালটি শুকোতে শুরু করেছে ঐ ডালটি শুকনো জায়গায় ১-২ ইঞ্চি নীচে থেকে কেটে জমি থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। কাটা ডালের মাথায় এবং নীচের দিকে এক ইঞ্চি মতো ডালে ছত্রাকনাশকের প্রলেপ লাগাতে হবে। ২ ভাগ ম্যানকোজেবের সঙ্গে এক ভাগ কার্বেন্ডাজিম বা বেনোমিল মিশিয়ে নিয়ে, এই মিশ্রণ জল দিয়ে পাতলা পেস্টের মতো করে নিয়ে প্রলেপ দিলে ভালো হয়। যে বাগানে এই রোগ নেই ওই বাগানে ডাল

ছাঁটার পর কপার অক্সিক্লোরাইডের ঘন লেই লাগানো যেতে পারে। সাধারণভাবে জমিতে কার্বেন্ডাজিম স্প্রে করা যেতে পারে।

সাদা গুঁড়ো বা পাউডার মিলডিউ (Power mildew) :

শীতকালে রোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাকের আক্রমণ শুরু হয়। কচিপাতায়, পুষ্পমঞ্জরী ও ডালের ডগার দিকে সাদা পাউডার ছড়িয়ে দেওয়ার মতো সাদা সাদা দাগ দেখা যায়। ভিজে আবহাওয়ায় রোগ বাড়ে।

এর দমনের জন্য ফুলফোটার আগে ও গুটি ধরার পর প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম হিসাবে জলে গোলা গন্ধক (সালফেট, সালটাফ) গুলে স্প্রে করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

কালো দাগ বা ব্লাক স্পট (Black Spot) :

পাতায় গোলাকার কালো দাগ হয়। দাগের চারদিক হলুদ বলয়ে ঘেরা থাকে। পাতায় একাধিক দাগ হলে পাতাটি হলদে হয়ে ঝরে পড়ে। রোগের প্রকোপ বাড়তে থাকলে এক এক করে পাতা হলুদ হয়ে ঝরে পড়ে।

রোগের লক্ষণ দেখা দিলে কার্বেন্ডাজিম (লিটারে ১ গ্রাম) বা ম্যানকোজেব ১০ দিন অন্তর স্প্রে করতে হবে। ঝরে পড়া পাতাগুলো গাছের গোড়া থেকে সংগ্রহ করে অবশ্যই পুড়িয়ে ফেলতে হবে। গাছের গোড়ায় মাটি ঝুরঝুর করে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করে দিতে হবে ও পটাশ সার ব্যবহার করতে হবে একটু বেশি মাত্রায়।

পোকা

রেড স্কেল (Red Scale) :

পোকাগুলি খুব ছোট ও লালচে বাদামি রঙের আঁশযুক্ত মোমের মতো দেখতে। এরা প্রথমে কচি ডালপালা আক্রমণ করে রস শুষে খায় এবং পরে পুরো গাছে ছড়িয়ে পড়ে। বর্ষার আগে ও পরে এদের আক্রমণ বেশি হয়, প্রতি লিটার জলে ২ মি.লি. ম্যালথিয়ন বা ডিমেথোয়েট মিশিয়ে ১০ দিন অন্তর কয়েকবার স্প্রে করতে হবে।

জাব পোকা (Aphid) :

পোকাগুলি খুব ছোট, গোলাপি লাল বা কালচে রঙের। শীতকালে এদের আক্রমণ দেখা যায়। ফুলের কুঁড়ি বা ডালের ডগায় দলবদ্ধ হয়ে বসে থাকে ও গাছের রস শুষে খায়। পোকার আক্রমণ দেখলে ১০ দিন অন্তর দুবার মিথাইল ডিমেটন বা ডিমেথোয়েট (লিটার দেড় মি.লি.) স্প্রে করতে হবে।

জেসি পোকা (Thrips) :

পোকাগুলো খুব ছোট ও সবুজ রঙের। ফুলের কুঁড়ি, কচি পাতা, নতুন গজানো কচি ডালে আক্রমণ করে ও রস শুষে খায়। গাছের বৃদ্ধি থেমে যায়, ফুল ফোটে না। শীতের শেষ থেকে বর্ষাকাল পর্যন্ত এর আক্রমণ দেখা যায়।

এই পোকা দমনের জন্য মনোক্রোটোফস বা এন্ডোসালফান (লিটার দেড় মি.লি.) স্প্রে করতে হবে।

চ্যাপার বিটল (Chaffer beetle) :

বর্ষাকালে এই পোকার আক্রমণ হয়। রাত্রিবেলা গাছের কচিপাতা খায়। ফলে পাতাগুলি ছিদ্রযুক্ত হয়। দিনের বেলা পোকাগুলি পাতার আড়ালে বা মাটিতে লুকিয়ে থাকে। এন্ডোসালফান (দেড় মি.লি.) বা ক্লোরপাইরিফস (৩ মি.লি.) স্প্রে করে এই পোকা দমন করা যায়।

মাজরা পোকা (Shoot borer) :

এরা গাছের ডাল ফুটো করে ভিতরের মজ্জা খেয়ে থাকে। ফুটোর বাইরে গুঁড়ো গুঁড়ো পদার্থ দেখা যায়। বর্ষার পর থেকে শীতের আগে পর্যন্ত এরা আক্রমণ চালায়। এন্ডোসালফান বা ডাই ক্লোরভস (লিটার দেড় মি.লি.) প্রয়োগ করে এদের প্রকোপ এড়ানো যায়।

শোষক পোকা (Jassid) :

পোকাগুলি সবুজ রঙের। লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। পাতার রস শুষে খায়। পাতা ফিকে সবুজ বা হলদে হয়ে যায়। পাতার ধার শুকিয়ে পোড়া পোড়া দেখায়। গ্রীষ্মকালে এদের আক্রমণ বেশি দেখা যায়। দমনের জন্য ব্যবহৃত কীটনাশক হল ডিমেথোয়েট বা মনোক্রোটোফস (Monocrotophos) (দেড় মি.লি. হারে)।

মশলার আধুনিক চাষবাস পদ্ধতি

মশলার নাম	উচ্চ ফলনশীল জাত	লাগানোর সময়	কন্দ বা চারা বসানোর দূরত্ব	জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ (বিঘাপ্রতি)	ফসল তোলা ও ফলন (বিঘাপ্রতি)
আদা	সুপ্রভা, সুরুচি, বরোদা, গরুবাথান, ভোঁইসে, মৌজালে	চৈত্র-বৈশাখ	সারি থেকে সারি ৮-১০ ইঞ্চি, কন্দ থেকে কন্দ ৮-১০ ইঞ্চি	২-২.৫ টন পচা গোবর সার ২৫০-৩০০ কেজি নিমখোল ৪০-৪৫ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট, ৫-৬ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ।	২-৩ টন কাঁচা আদা হিসাবে ব্যবহারের জন্য বীজ বোনার ৭-৮ মাস পর আদা তোলা হয়।
হলুদ	কস্তুরী, রোমা, সুগুনা, রাজেন্দ্র, সোনিয়া, সুগন্ধম, কৃষ্ণ, পটনাই	বৈশাখের শুরু থেকে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি	সারি থেকে সারি এবং কন্দ থেকে কন্দ ১০ ইঞ্চি	মূলসার : ২-৩ টন পচা গোবর সার, ৫০ কেজি এস.এস. পি, ১০ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ চাপান : ১৩ কেজি ইউরিয়া এবং ৫ কেজি পটাশ	৪-৪.৫ টন জাতের প্রকার বেছে বীজ বোনার ৮-১০ দিন পর ফসল তোলা হয়।
রসুন	ফাগুয়ারি, কাণ্ড মারি, তাতুল, শ্রীতল, ইটালিয়ান ও দেশি	অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাস	সারি থেকে সারি ১৫ সেমি বীজ থেকে বীজ ১০ সেমি	মূলসার : ২০ কুইঃ গোবর সার, ১০ কেজি ইউরিয়া, ৩৩ কেজি এস.এস.পি., ৫ কেজি পটাশ সার। চাপান : ৬ কেজি ইউরিয়া।	৮০০-১০০০ কেজি। বীজ বোনার ১১০-১২০ দিন পর
লঙ্কা	সূর্যমুখী, পুসা, জ্বলা, এন.পি. ৪৬এ, জি-৩, সিটি, সুলি	পৌষ-মাঘ এবং শ্রাবণ-ভাদ্র	সারি থেকে সারি ৬০-৭৫ সেমি চারা-চারা ৩০-৪৫ সেমি.	মূলসার : ১০ ১/২ কেজি ইউরিয়া, ৩০ কেজি এস.এস.পি., ৯ কেজি পটাশ। চাপান : ৫ ১/২ কেজি ইউরিয়া ৩০ দিন পর প্রথম চাপান এবং ৬০ দিন পর দ্বিতীয় চাপান।	২০০-৩০০ কেজি শুকনো লঙ্কা
ধনে	রাজেন্দ্র, স্বাতী, রাজস্থান, ধনিয়া, সাথী, সিদ্ধ, গুজরাট-ধনিয়া-১	কার্তিকের শেষ থেকে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি	সারি থেকে সারি ১০-১২ ইঞ্চি, চারা থেকে চারা ৪ ইঞ্চি।	মূলসার : ২০ কুইঃ পচা গোবর সার, ৯ কেজি ইউরিয়া, ৩৩ কেজি ফসফেট সার, ৫ কেজি পটাশ সার। প্রথম চাপান : ৪.৫ কেজি ইউরিয়া। দ্বিতীয় চাপান : ৪.৫ কেজি ইউরিয়া।	১৫০-১৭৫ কেজি বীজ বোনার ১১০-১২০ দিন পর

মশলার নাম	উচ্চ ফলনশীল জাত	লাগানোর সময়	কন্দ বা চারা বসানোর দূরত্ব	জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ (বিঘাপ্রতি)	ফসল তোলা ও ফলন (বিঘাপ্রতি)
মেথি	রাজস্থান মেথি-১, রাজেন্দ্র, ক্রান্তি, কোয়েম্বাটে র-১ কোয়েম্বাটের-২ হিসার, সোনালি	কার্তিকের শেষ থেকে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি	সারি থেকে সারি ১০-১২ ইঞ্চি, চারা থেকে চারা ৪ ইঞ্চি	মূলসার ঃ ১৫-২০ কুইঃ পচা গোবর সার, ১২ কেজি ইউরিয়া, ৫০ কেজি ফসফেট সার, ৫ কেজি পটাশ সার।	১৮০-২০০ কেজি বীজ বোনার ১০০-১১০ দিন পর।
মৌরী	রাজেন্দ্র, সৌরভ, রাজস্থান মৌরী ১০১, গুজরাট মৌরী-১, গুজরাট মৌরী-২	কার্তিকের শেষ থেকে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি	সারি থেকে সারি ১৮-২৪ ইঞ্চি, চারা থেকে চারা ৮ ইঞ্চি	মূলসার : ১৫-২০ কুইঃ পচা গোবর সার, ১৩ কেজি ইউরিয়া ৩৩ কেজি ফসফেট সার ২০ কেজি পটাশ সার। চাপান সার : প্রথম চাপান ৬.৫ কেজি ইউরিয়া। দ্বিতীয় চাপান ৬.৫ কেজি ইউরিয়া	২০০-২৫০ কেজি বীজ বোনার ১২০ দিন পর।
কালোজিরা	রাজেন্দ্র শ্যামা, আজাদ কালোজিরা	কার্তিকের শেষে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি	সারি থেকে সারি ১২ ইঞ্চি চারা থেকে চারা ৬ ইঞ্চি	মূলসার : ১৫-২০ কুইঃ পচা গোবর সার, ৬ কেজি ইউরিয়া ২৫ কেজি ফসফেট সার, ৭ কেজি পটাশ সার। দুইবার চাপান : প্রতিবার ৭ কেজি ইউরিয়া।	১০০-১৫০ কেজি বীজ বোনার ১১০-১২০ দিন পর।
জোয়ান	গুজরাট জোয়ান-১, আর.এ.১৯, ল্যাম, সিলেকসন-১ ল্যাম সিলিকন-২	কার্তিকের শেষ থেকে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি	সারি থেকে সারি ১৮ ইঞ্চি, চারা থেকে চারা ৬-৮ ইঞ্চি	মূলসার : ১৫-২০ কুইঃ পচা গোবর সার, ৬ কেজি ইউরিয়া ২৫ কেজি ফসফেট সার, ৭ কেজি পটাশ সার দুইবার চাপান : প্রতিবার ৩ কেজি ইউরিয়া।	১০০-১৫০ কেজি বীজ বোনার ১৪০-১৫০ দিন পরে

বাঁশ চাষ ও বাঁশবাগানের পরিচর্যা

চাষের সময় : জ্যৈষ্ঠ থেকে আষাঢ়-শ্রাবণ (মে-জুলাই) মাস বাঁশ চাষ করার আদর্শ সময়।

চারা বসানোর দূরত্ব : চারা থেকে চারা ৪-৬ মিটার এবং সারি থেকে সারি ৬-৭ মিটার বিঘাতে ২৩৮-৪১৬টি চারা লাগাবে।

জমি তৈরি ও চারা বসানো : নির্দিষ্ট দূরত্বে ৩০ সে.মি. x ৩০ সে.মি. x ৩০ সে.মি. গর্ত করে; প্রতি গর্তে ১৫ কে.জি. পচা গোবর সার, কেঁচো সার ভরে দিতে হবে। কাণ্ডে কাটা চারা বৃষ্টি শুরু হওয়ার সাথে সাথে বসাতে হয়। চারা বসানোর এক সপ্তাহে পরে চারা প্রতি ৬০ গ্রাম ইউরিয়া, ১৫ গ্রাম সিঙ্গেল সুপার ফসফেট এবং ১৫ গ্রাম মিউরেট অব পটাশ সার প্রয়োগ করলে ভালো হয়।

আগাছামুক্ত করা : প্রতি চারার চারপাশে আগাছামুক্ত করতে হবে। নতুবা চারার শিকড় ও কাণ্ড দুর্বল হয়ে পড়বে।

বাঁশবাগানের পরিচর্যা :

সার প্রয়োগ : দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে বা তার ঊর্ধ্বে বছরে বর্ষার আগে নীচের মাত্রানুযায়ী সার প্রয়োগ করতে হবে। সমস্ত সারটি সমানভাবে প্রতিটি ঝাড়ের চারপাশে ছড়িয়ে দিতে হবে। রাউন্ড ফিগারের পরিমাণ সার প্রয়োগ করলেও চলবে—

সারের নাম	কেজি/হেক্টর	
	দ্বিতীয় বছর	তৃতীয় বছর ও তার ঊর্ধ্বে
ইউরিয়া (৪৬%)	১০৯	২১৭
সুপার ফসফেট (১৬%)	১৫৬	৩১৩
পটাশ (৬০%)	৪২	৫০০

উৎস : বেত ও বাঁশ প্রযুক্তি কেন্দ্র, গুয়াহাটি, অসম।

মালিচিং বা আচ্ছাদন ও ঢাকা দেওয়া : মালিচিং বা আচ্ছাদন দিলে বাঁশের সঠিক ও উপযুক্ত বৃদ্ধি হয়। নতুন কচি চারা গজাতে এবং কচি চারাকে সরাসরি রোদের হাত থেকে রক্ষা করে মালিচিং আগাছার বৃদ্ধি বন্ধ করে, মাটির রসকে সংরক্ষণ করে এবং মাটির জৈবপদার্থ বৃদ্ধি করে বাঁশের গায়ে লেগে থাকা ছাল, পাতা ও মাটির উপরে ছড়িয়ে থাকা সামান্য জৈবপদার্থ বাঁশঝাড়ের চারপাশে সমানভাবে ছড়িয়ে দিয়ে মালিচিং বা আচ্ছাদনের কাজ করা হয়।

কাণ্ডের গোড়ার মাটি সরানো : গরমকালে গরম আবহাওয়া ঝাড়ের গোড়ার মাটি সরিয়ে এক/দেড় সপ্তাহ রেখে, তারপর কিছু সারসহ মাটি দিয়ে ঢেকে দিলে কুঁড়ি তাড়াতাড়ি ফোটে এবং কচি চারার বাড়-বৃদ্ধি খুব দ্রুত হয়। মাটি সাবধানে সরাতে হবে যাতে কাণ্ড বা কুঁড়িতে আঘাত না লাগে। এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে বাঁশের সংখ্যা দ্বিগুণ বা তার বেশি হয়।

ঝাড়ের পরিচর্যা : সঠিকভাবে ঝাড়ের পরিচর্যা করলে উৎপাদন ও বাঁশের গুণমান বৃদ্ধি পায়। অপ্রয়োজনীয় ঝাড় সরিয়ে দিয়ে, ঝাড়ের ঘনত্ব হ্রাস করতে হয়। একটি ঝাড়ে ৯-১২টি বাঁশ থাকলে সেটি আদর্শ ঝাড় হয়। প্রতি বছরে ৩-৪টি উপযুক্ত বয়সের বাঁশ নিয়ে ঝাড় হলে ভালো হয়। চার বছরের বেশি বয়সের বাঁশ কেটে নেওয়া উচিত। কোনো ঝাড়ে বেশি বাঁশ তৈরি করতে কিছু ঝাড় কেটে দিলে ভালো। স্বাস্থ্যবান চারা এবং নতুন বাঁশ গজানোর জন্য ঝাড়ের পচন রোধ করতে হয়। অথবা রোগাক্রান্ত ঝাড় মাটি থেকে তুলে ফেলতে হয়।

বাঁশ কাটা ও সংগ্রহ : আমাদের রাজ্যে মূলত পরিপক্ক বাঁশ ঝাড় থেকে সংগ্রহ করা হয়। বাঁশচাষের চতুর্থ বছরের পর বাঁশ কাটা যায়। শীতকালে বাঁশ কাটতে হয়। বর্ষাকালে কখনোই বাঁশ ঝাড় থেকে কাটা/সংগ্রহ করা উচিত নয়। শীতকালে শুষ্ক আবহাওয়ায় বাঁশের শর্করার পরিমাণ কম থাকায় বাঁশ মজবুত থাকে। এই সময় ঘুণ পোকাসহ অন্যান্য পোকার আক্রমণ কম হয়। কেবলমাত্র পরিপক্ক বাঁশ কাটা উচিত। কাটার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে কচি বাঁশ বা অঙ্কুরিত বাঁশ যেন নষ্ট না হয়। মাটি থেকে প্রথম গাঁটের কাছে কাটতে হয়। হেক্টরে গড়পড়তা ১৫০০-২০০০টি বাঁশ পাওয়া যায়।

অন্যান্য রাজ্যে খাওয়ার জন্য, আচারের জন্য একদম কচি/অঙ্কুর বাঁশ কাটা হয়। এই কাজ বাঁশ বসানোর তিন বছর পর অর্থাৎ দুটো বর্ষা খাওয়ার পর করতে হয়। অঙ্কুর বাঁশ বর্ষাকালে কাটতে হয়। অঙ্কুর বাঁশ মাটি থেকে ১০-১৫ সে.মি. নীচে অঙ্কুর এবং কাণ্ডের মাঝে নরম অংশে কাটতে হয়। হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ২.৫০-২.৭৫ টন।

বাঁশের ক্ষতিকারক রোগ ও কীটপতঙ্গ : বিভিন্ন রোগ ও কীটপতঙ্গ বাঁশ ঝাড়ের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। এর ফলে বাঁশের উৎপাদন এবং গুণমান কমে যায়।

রোগ : বিভিন্ন ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের আক্রমণে বাঁশের বিভিন্ন রোগ দেখা যায়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল বাঁশ ঝাড় ধসা বা কাম ব্লাইট-এতে কচি এবং পরিণত বাঁশে পচন ধরে। ঢলে পড়া রোগ - এতে কচি ও তার পরবর্তী বাঁশ ছত্রাকের দ্বারা আক্রান্ত হয় ও পচে ঢলে পড়ে।

প্রতিকার : গাছের গোড়ায় যাতে জল না দাঁড়ায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। কার্বেন্ডাজিম বা বেনোমিল ১ গ্রাম প্রতিলিটার জলে গুলে কচি বাঁশে বা বড় বাঁশে স্প্রে করতে হবে এবং সংলগ্ন মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে।

কীটপতঙ্গ : বাঁশ হল তৃণজাতীয় উদ্ভিদ। নানা জাতীয় তৃণভোজী কীটপতঙ্গ গাছের রস খেয়ে, ডিম পেড়ে বাঁশের শারীরিক ক্ষতিসাধন করে, রোগ ছড়িয়ে, বাঁশের মধ্যে বিষাক্ত পদার্থ ঢুকিয়ে ব্যাপক ক্ষতি করে। এর ফলে বাঁশের পাতা ঝরে পড়ে, কচি বাঁশ নষ্ট হয়, বাঁশ নুয়ে পড়ে ও বাঁশ মারা যায়। ফলে বাঁশের উৎপাদন ও গুণমান কমে যায়।

স্মুট মথ : পূর্ণাঙ্গ মথ পাতা ও কচি বাঁশে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে যে লার্ভা বের হয়, তা পাতা ও কচি বাঁশ খেয়ে ক্ষতি করে।

প্রতিকার : মাটিতে লাঙল চালিয়ে কোকুনাকে মাটিতে পুঁতে দিতে হবে। এন্ডোসালফান ২.৫ মি.লি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করলে লার্ভা মারা যায়। তাছাড়া ডিম পাড়ার আগে মথকে মেরে দিলে এপিডেমিক হতে পারে না।

সবুজ ল্যাদাপোকা : এই সবুজ রঙের ল্যাদাপোকা পাতার সবুজ অংশ খেয়ে ক্ষতি করে। কখনও পাতাগুলোকে মুড়ে দেয় এবং তার ভেতর থেকে কুরে কুরে খায়।

উইপোকা : উইপোকা মাটিতে বাসা বেঁধে থাকে। শুকনো বাঁশ খেয়ে ক্ষতি করে।

প্রতিকার : ক্লোরোপাইরিফস (২০ ই.সি.) ২.৫ মি.লি. প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

বাঁশের বিট্‌ল/ঘুণপোকা : কাটা বাঁশ ও বাঁশের উপকরণে গর্ত করে ঢুকে ভিতরের শাঁস খেয়ে গুঁড়ো পাউডার বের করে ব্যাপক ক্ষতি করে।

প্রতিকার : বাঁশ সংরক্ষণে উল্লেখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

গবাদি পশু : গবাদি পশু বাঁশবাগানে ঢুকে নতুন বাঁশের ব্যাপক ক্ষতি করে।

প্রতিকার : বেড়া দিতে হবে অথবা গভীর নালা কেটে দিতে হবে।

মাখনা চাষ

মাখনাগাছ ঠিক পদ্মগাছের মতো কাঁটাযুক্ত জলজ গাছ। এর পাতা পদ্মের মতো জলে ভেসে থাকে। পাতার উপরের অংশ ঘন সবুজ আর নিচের অংশ লালচে ও বেগুনি রঙের। ফুল ও ফলের বৃদ্ধি হয় জলের নিচে। কখনো ফুল জলের উপরেও ভাসে। একটি ফুলে ২০ থেকে ৩০টি নীল, বেগুনি বা লাল রঙের পাপড়ি থাকে। এক-একটি ফলে ২০ থেকে ৫০টির মতো বীজ হয়। তার ফলের মধ্যে কালো গুলির মতো যে বীজ হয়, তার ভিতরে সাদা শাঁস থাকে। খোলায় ভাজলে ওই সাদা শাঁস খইয়ের মতো দেখতে হয়। একে লাবা বলে। মাখনায় প্রচুর পরিমাণে শর্করা, ফ্যাট, প্রোটিন ও খনিজ পদার্থ থাকে। সহজপাচ্য বলে শিশুখাদ্য এবং বয়স্কদের খাবার হিসাবে এর ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। মাখনার ওষধি গুণও রয়েছে। খেতে সুস্বাদু ও পুষ্টিকর এই খইয়ের দেশীয় বাজার তো বটেই, আন্তর্জাতিক বাজারেও চাহিদা রয়েছে।

আবহাওয়া : মাখনা সাধারণত উষ্ণ আবহাওয়ার ফসল। ঝিরঝিরে বৃষ্টির সময়ে মাখনার দ্রুত বৃদ্ধি হয়। তবে শিলাবৃষ্টি ওই গাছের প্রধান শত্রু। শিলাবৃষ্টিতে পাতায় পচন ধরে গাছ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। অতিরিক্ত বৃষ্টিতে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

মাটি : যে কোনো জলাশয় বা অগভীর পুকুরে মাখনার চাষ হতে পারে। সাধারণত অগভীর কাদাযুক্ত বা পলিযুক্ত পাঁক মাটির জলাভূমি, পুকুর বা জলাশয়ে মাখনা চাষ ভালো হয়। জলের নিচে ১৫ থেকে ২০ সেন্টিমিটার মতো আঠালো কাদাযুক্ত নরম মাটিতে গাছের বাড়বৃদ্ধি ভালো হয়।

বোনার সময় : পৌষ মাসের (ডিসেম্বরের মাঝ) মধ্যে মাখনার বীজ ফেলতে হয়। মাঘ (ফেব্রুয়ারির মাঝ) মাসের দিকে মূল জলাজমিতে মাখনা রোপণ করা হয়।

রোগপোকা ও প্রতিকার :

মাখনাগাছ ও ফলে বেশ কিছু পোকার আক্রমণ দেখা যায়, সময়মতো ব্যবস্থা না নিলে ফলন কমে যেতে পারে।

- **পামড়ি পোকা** — এই পোকা মাখনাগাছের মূলে আক্রমণ করে। পোকা মূলের বিভিন্ন অংশ খেয়ে গাছের ক্ষতি করে। এ ক্ষেত্রে পোকা নিয়ন্ত্রণের একটি পদ্ধতি হল একই জমিতে বারবার মাখনা চাষ না করা।
- **নীল পোকা** — পূর্ণাঙ্গ পোকা পাতায় ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে শূককীট গাছের কচিপাতা খেয়ে ফেলে। তাছাড়া পাতা ও ফুলের সবুজ অংশ খেয়ে নেয়। পাতা জালিকায় পরিণত হয়। যেহেতু যেখানে মাখনা চাষ হয়, একই জলাভূমিতে মাছ চাষ করা হয় বলে কীটনাশক প্রয়োগে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। নীল পোকা পাতার উপরের দিকে দেখা গেলে পাটের দড়ি কেরোসিন তেলে ভিজিয়ে পাতায় হালকা করে ঘষে দিলে উপকার পাওয়া যাবে। পরিমাণে অল্প হলে হাত দিয়ে পোকা পরিষ্কার করে দেওয়া যেতে পারে।
- **জাব পোকা** — জাব পোকা পাতা ও গাছের কচি অংশের রস চুষে খায়। ফলে আক্রান্ত অংশ পচে যায়। পাতার উপরে জল স্প্রে করলে উপকার পাওয়া যায়।

- **পচন রোগ**— এই রোগে গাছের শিকড় ও ডাঁটায় পচন ধরে। গাছ ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়। প্রতিকারের জন্য প্রথমেই আক্রান্ত গাছ জমি থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। প্রতি ২-৩ বছর চাষের পরে অন্ততপক্ষে এক বছর ওই জমিতে মাখনা চাষ বন্ধ রাখতে হবে। জল পরিষ্কার রাখতে হবে।

সাধারণত বিঘাপ্রতি ৫ কেজি বীজ ছড়িয়ে বা আগের জলাজমিতে থেকে যাওয়া বীজের সাহায্যে চাষের প্রচলন রয়েছে। বীজতলায় চারা তৈরি করে মূল জমিতে রোপণ করলে ফলনও ভালো পাওয়া যায়। আগের বছরের সংগ্রহ করা বীজ থেকে পুষ্ট ও নীরোগ বীজ বেছে নিয়ে এক থেকে দেড় ফুট গভীরতার জলাভূমিতে বীজতলা তৈরি করতে হয়। বীজতলায় আড়াই থেকে ৪ কুইন্টাল পচা জৈব সার ছড়িয়ে ২ থেকে ৩টি চাষ দিতে হবে। তারপরে বীজ ছড়িয়ে দিতে হবে। বীজতলাতে যে সমস্ত চারা বার হবে, সেটা মূল জমিতে রোপণ করতে হবে। বীজ বীজতলাতে ফেলার আগে অঙ্কুর বার করে নিতে পারলে চারার সংখ্যা বেড়ে যায়।

মূল জমি তৈরি ও চারা রোপণ : মূল জমিতে চারা রোপণ করার আগে ২-৩টি চাষ দিতে হবে। এই সময়ে জলায় ২ ফুট পরিমাণ জল থাকলে চারার পক্ষে আদর্শ। ২-৩টি পাতাযুক্ত ১ ফুট লম্বা চারা রোপণ করতে হবে। একটি সারি থেকে অন্যটির এবং একটি গাছ থেকে অন্যটির দূরত্ব রাখতে হবে ১ মিটার। চারা ৫-৬ সেমি গভীর করে রোপণ করতে হবে।

সার প্রয়োগ : মাখনা চাষে সচরাচর কোনো সার প্রয়োগ করতে দেখা যায় না। জলাশয়ের চারপাশের সমস্ত আগাছা পচে জৈব সারের কাজ করে। জলাভূমির উর্বরতা বুঝে মূল জমি তৈরির সময়ে বিঘাপ্রতি দেড় থেকে ২ টন পচা জৈব সার বা কেঁচো সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সেচ ও জল নিষ্কাশন :

গাছ বড় হওয়ার সময়ে ২-৩ ফুট এবং বর্ষার জলের গভীরতা ৫-৬ ফুট থাকা দরকার। চৈত্র-বৈশাখে (মার্চ-জুন) মাসে জল কমে গেলে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। বর্ষার জল বেড়ে গেলে কোনো ক্ষতি হয় না, তবে প্রয়োজন মনে হলে জল বার করে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

ফুল ফোটা ও জল আসার সময় : মাখনা চারা রোপণ করার ৬০ থেকে ৭০ দিন পরে বৈশাখ মাসে (এপ্রিলের মাঝামাঝি) গাছে ফুল আসতে শুরু করে।

আশ্বিন-কার্তিক (সেপ্টেম্বর-নভেম্বরের মাঝে) মাস পর্যন্ত নাগাড়ে ফুল ফোটে। ফল আসে জ্যৈষ্ঠের (মে মাসের মাঝ) শুরু থেকে।

ফসল সংগ্রহ : ফল পরিপক্ক হলে ফল ত্বক পচে বীজগুলি বার হয়ে আসে। প্রথমদিকে বীজগুলি জলে ভাসতে থাকে। পরে বীজ ভারী হয়ে গাছের গোড়ার দিকে কাদামাটির উপরে থাকে। তিনটি ধাপে বীজ সংগ্রহ করা হয়। জুন-জুলাই (আষাঢ়-শ্রাবণ) মাসে যে ফলন পাওয়া যায়, তাকে বলে 'লোসর'। দ্বিতীয় দফায় আগস্ট-সেপ্টেম্বর (ভাদ্র-আশ্বিন) মাসে যে ফলন পাওয়া যায় তাকে বলে 'মারকাট-১'। দড়ি ও বাঁশের সরু কাঠি দিয়ে তৈরি এক ধরনের জালের সাহায্যে বীজ সংগ্রহ করা হয়। কাদামাটি-সহ বীজগুলিকে সংগ্রহ করে পরিষ্কার জলে ধুয়ে নেওয়া হয়। এক

বিঘা জমিতে ২ থেকে ৩ কুইন্টাল বীজ পাওয়া যায়। তবে এই চাষে উপযুক্ত পরিচর্যা, জৈব সার প্রয়োগ ও রোগপোকা নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে চাষিভাইয়েরা এর ফলন ৪ থেকে ৫ কুইন্টাল পর্যন্ত পেতে পারেন।

বীজ সংরক্ষণ : বীজগুলিকে রোদে ভালোভাবে শুকিয়ে বস্তায় বেঁধে, পরিষ্কার জায়গায় মজুত করতে হবে। পরের বছর বীজ হিসাবে ব্যবহারের জন্য চিহ্নিত বীজ নাইলনের জালের মধ্যে জড়িয়ে ছোট ডোবা, পুকুর বা জলাশয়ে ডুবিয়ে রাখতে হবে। বাড়িতে রাখতে হলে চৌবাচ্চা, বড় চালায় চুবিয়ে রাখা যেতে পারে।

বিশেষ পরামর্শ :

- নীচু জলাজমির সদ্ব্যবহারে ও সংরক্ষণে মাখনার চাষ করুন।
- জৈব সার, জৈব কীটনাশক ব্যবহার করে মাখনা চাষ করুন।
- কচুরিপানা ও অন্যান্য পানা পচিয়ে জৈব সার তৈরি করুন।
- নিমের পাতা, ছাল, বীজ থেকে কীটনাশক তৈরি করুন।
- নিমগাছের চাষ বাড়ান।
- জলাজমির চারধারের উঁচু জমিতে সজনে চাষ করে বাড়তি আয় করুন।

তেজপাতা চাষ

তেজপাতা রান্নাঘরের বা রান্নার কাজের এক গুরুত্বপূর্ণ মশলা উপাদান। তেজপাতা মশলা হিসাবে যেমন ব্যবহৃত হয়, পোলাও-বিরিয়ানিতে সুগন্ধ ছড়াতে, আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরিতে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। তেজপাতা গাছের ছাল বা বাকল (Bark) দারচিনিতে ভেজাল দেওয়া হয়। মুখের রুচি ফিরিয়ে খিদে বাড়াতে পেটের ব্যথা ও পাতলা পায়খানা কমাতে, বাত ব্যাধির নিরাময়ে এবং শরীর-মন চাঙ্গা করতে তেজপাতা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এমনকি বিছে কামড়ালে তার ব্যথা উপশমে তেজপাতা ব্যবহার করা হয়।

মূলত : উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে তেজপাতা চাষ হয়। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর জেলায় বাগিচা করে বাণিজ্যিকভাবে চাষ হয়। তাছাড়া চা ও অন্যান্য ফল বাগানের ধারে ধারে চাষ হয়। উত্তরবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে তেজপাতার চাষ করা হয়ে থাকে। দেশের ব্যাপক চাহিদার সাথে বিদেশে রপ্তানিরও বেশ ভালো সুযোগ রয়েছে।

চাষ পদ্ধতি : নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে তেজপাতা চাষ করা হয়ে থাকে —

১। **চারা তৈরি** — তেজপাতার কাটিং গুটিকলম পদ্ধতিতে চারা তৈরি করা হয়।

২। **চারা লাগানো** — মূল জমিতে ১ বছর বয়সের চারা ৩ মি. x ৩মি. দূরত্বে ৬০ সেমি x ৬০ সেমি x ৬০ সেমি, গর্তে বসানো হয়। বিঘায় ১৫টি চারা লাগবে। চারা বসানোর ১ মাস আগে গর্ত করে গর্তের মাটির সাথে পাতাপচা, গোবর বা খামারের সার মিশিয়ে পুনরায় গর্ত ভর্তি হয়ে থাকে। জুন-জুলাই মাসই হল চারা লাগানোর উপযুক্ত সময়। চারা লাগানোর পর কিছুদিন ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে। বড় গাছ, ছায়া বা রোদ সব জায়গাতেই বেড়ে উঠতে পারে।

৩। **সার প্রয়োগ ও পরিচর্যা** : প্রথম বছরে প্রতি গাছের গোড়ায় ৩০ গ্রাম ইউরিয়া, ১১২ গ্রাম সিঃ সুঃ ফসফেট এবং ৯০ গ্রাম মিউরেট অব্ পটাশ প্রয়োগ করা যেতে পারে। দ্বিতীয় বছরে ওই সারের পরিমাণ দ্বিগুণ করতে হবে। প্রত্যেক বছরে ওই সারের পরিমাণ এমনভাবে বাড়াতে হবে, যাতে ১০ বছর বয়সী গাছে ৪৩০ গ্রাম ইউরিয়া, ১১২৬ গ্রাম সিঃ সুঃ ফসফেট এবং ৭১৫ গ্রাম মিউরেট অব্ পটাশ সার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। প্রতি গাছের গোড়ায় ২০ কেজি করে গোবর সারও প্রয়োগ করা উচিত।

ফসল তোলা : চারা লাগানোর ৪ - ৫ বছর পর থেকেই গাছের শাখা কেটে পাতা সংগ্রহ করা যেতে পারে। ঝরঝরে শুকনো মরসুমে অর্থাৎ অক্টোবর থেকে মার্চ অথবা ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাসে পাতা সংগ্রহ করা যেতে পারে। বৃষ্টিতে পাতার সুগন্ধ নষ্ট হয়ে যায়। গাছ থেকে পাতা তোলার পর ৫-৭ দিন ছায়াতে শুকিয়ে নেওয়া যায় এবং তারপর বিক্রয়ের জন্য বস্তায় ভরা হয়।

ফলন : একটি গাছ থেকে বছরে ৪০-১০০ কেজি শুকনো পাতা পাওয়া যায়।

শস্য সুরক্ষা : তেজপাতা বেশ কয়েকটি রোগপোকা দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং ফলস্বরূপ ফলন প্রচণ্ডভাবে মার খায়ঃ—

১। **গোলাপি রোগ :** ছত্রাক ঘটিত রোগটির সংক্রমণে আক্রান্ত কাণ্ডের উপর ধূসর গোলাপি সাদা আস্তরণ জমতে দেখা যায়, ছাল নষ্ট হয়ে যায় এবং অবশেষে ওই অঞ্চল থেকে উপরের অংশটি শুকিয়ে যায়।

প্রতিকার : রোগটির নিয়ন্ত্রণের জন্য যে কোনো তামাঘটিত রোগনাশক (ব্লাইটক্স, ব্রুকপার, ফাইটোনাল ইত্যাদি) ৪ গ্রাম ১ লিটার জলে গুলে স্প্রে করা যেতে পারে।

২। **চারা ধসা :** ছত্রাক ঘটিত এই রোগটি চারা অবস্থায় দেখা যায়। ছোট ছোট চারার কাণ্ডে জলবসা দাগ ধরে এবং ওই অংশে ছাল কালচে ধূসর হয়ে আক্রান্ত গাছ মরে যায়।

প্রতিকার : রোগটির নিয়ন্ত্রণের জন্য যে কোনো তামাঘটিত রোগনাশক (ব্লাইটক্স, ব্রুকপার, ফাইটোনাল ইত্যাদি) ৪ গ্রাম ১ লিটার জলে গুলে স্প্রে ও চারার গোড়ায় মাটি ভিজিয়ে দিয়ে রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

৩। **পাতায় দাগ :** ছত্রাকঘটিত রোগের সংক্রমণে আক্রান্ত পাতায় কালচে বাদামি বসা দাগ দেখা যায়।

প্রতিকার : রোগটির নিয়ন্ত্রণের জন্য যে কোনো তামাঘটিত রোগনাশক (ব্লাইটক্স, ব্রুকপার, ফাইটোনাল ইত্যাদি) ৪ গ্রাম ১ লিটার জলে গুলে স্প্রে করা যেতে পারে।

৪। **পাতাখেকো ল্যাদা পোকা :** ঘন নীলচে রঙের ল্যাদাগুলি বড় হয়ে কালো রঙের হয় এবং মাথায় লাল দাগযুক্ত হয়। ল্যাদার পিঠে গোছা গোছা, লম্বা, হলুদ ও কালো শুঁয়ো থাকে। ল্যাদা কচিপাতা খেয়ে ক্ষতি করে।

প্রতিকার : পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য কুইনলফস বা অক্সিডেমিটন মিথাইলজাতীয় কীটনাশক স্প্রে করা যেতে পারে।

সজনে চাষ

সজনে ডাঁটার জনপ্রিয়তা মরশুম এলেই বোঝা যায়, বাজারে আসার সাথে সাথে উধাও হয়ে যায়। যদিও দাম কোনো অংশে কম নয়। সুতরাং বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোয় অনেকে নতুন কিছু চাষ করার মানসিকতায় সজনে চাষের দিকে এগোতে পারেন। এতে ভালো রোজগার হয়, অথচ পরিশ্রম বা সময় কম দিতে হয়।

* বাজারে সজনের উচ্চ চাহিদা রয়েছে।
* সজনের চাষপদ্ধতি বেশ সহজ।
* চাষের খরচ বেশ কম, নিশ্চিত লাভ।
* বীজ বা ডাল কেটে বংশবৃদ্ধি করা হয়।
* সজনের উন্নত জাতগুলো অধিক ফলনদায়ী।

জাত নির্বাচন :

সাধারণ সজনে বছরে একবার ফল দেয়। তবে 'নাজনে' নামে অন্য এক প্রজাতি বারোমাস ফল দেয়। নাজনের ফল মোটা ও বেঁটে। 'টাটানগর' হল উচ্চ ফলনশীল একটি নাজনের জাত। এর ফল লম্বা এবং গাছে বছরভর ফুল ও ডাঁটা থাকে। বছরে একবার ফল দেয় এমন জাত হল — জাফনা, জলপানম। ডাঁটা প্রায় এক মিটার লম্বা। কোডিকাল জাতটির ফল ১৫-২০ সেমি লম্বা, সুস্বাদু ও শাঁসালো। মুলানুর জাতের ফল ৩০-৪৫ সেমি লম্বা। এছাড়া আরও কিছু উচ্চফলনশীল ও উন্নত জাত আছে যেমন — পি কে এম-১। সংকর জাত হল পি কে এম-২। এই সব জাতের চারা রোপণের ৪ মাসের মধ্যে গাছে ফুল আসে এবং ৬ মাসে ডাঁটা ফলে। গাছপ্রতি গড়ে ২০০ সংখ্যক ডাঁটা পাওয়া যায়। এছাড়া স্থানীয় জাতও চাষ করা যায়।

চারা তৈরি :

নতুন সজনে গাছ তৈরি করার কোনো বিশেষ খাটুনি নেই। বীজ বা ডাল কেটে সজনের চারা তৈরি করা যায়।

সজনের চারা তৈরির উপযুক্ত জায়গা হল পলিথিন প্যাকেট, যার মাপ ১৫ সেমি বাই ৭ সেমি। মে-জুন মাস হল এর বীজ ফেলার উপযুক্ত সময়। এই সময় প্রতি প্যাকেটে ২ : ১ অনুপাতে ভালো মাটি ও পচা গোবর-সার বা পাতা পচা সার ভরে দিতে হয়। প্রতি প্যাকেটে ২টি করে বীজ পুঁতে ছায়ায় রেখে নিয়মিত জল দিতে হয়। বীজ ফেলার ৮-১০ দিনের মধ্যে চারা গজাতে শুরু করে। ৩০-৩৫ দিনে চারা মূল জমিতে রোপণের উপযুক্ত হয়। এক বিঘা জমির জন্য ১০০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়।

ডাল কেটে চারা তৈরি করলে দেড় থেকে দুই বছরের মধ্যেই ফুল, ফল (ডাঁটা) পাওয়া যায়। অঙ্গজ জননের দ্বারা বংশবিস্তার করতে হলে প্রায় এক থেকে দু-মিটার লম্বা ডাল কেটে পুকুরের পাড়ে বা সরস জায়গায় পুঁতে,

উপরের কাটা মাথায় পাঁক বা মাটির একটা দলা দিয়ে দিতে হয়। কিছুদিনের মধ্যেই নতুন ডাল গজিয়ে চারা তৈরি হয়।

মূল জমি তৈরি ও চারা রোপণ :

গভীর চাষ দেওয়া জমিতে সারি থেকে সারি এবং চারা থেকে চারা ২.৫ মিটার দূরত্বে ১ ফুট মাপের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ গভীরতায় গ্রীষ্মকালে গর্ত করতে হয়। গর্তপিছু ২ কেজি পরিমাণ গোবর সার ও মাটি মিশিয়ে ভর্তি করতে হয়। পরে বৃষ্টির সময় পলিথিন প্যাকেটের নিচের অংশ কেটে নিয়ে গর্তে বসাতে হবে। বিঘাতে ২০০টি চারা রোপণ করা যায়। বর্ষার শুরুতে কাটা ডাল থেকে নতুন চারা ১২-১৫ হাত দূরত্বে গর্ত করে বসাতে হয়। গর্তে উপরে উল্লিখিত সার ভরে দিতে হয়। বেড়ার খুঁটি হিসাবে, জমির ধারে, যে সব জায়গায় অন্য গাছ করা যায় না, অল্প ছায়ায় পুকুরের পাড়ে, ফাঁকা পরিত্যক্ত জায়গায় সজনে চারা লাগালেই হয়।

অন্তর্বর্তী পরিচর্যা :

গাছের প্রথমাবস্থায় নিয়মিত আগাছা পরিষ্কার করতে হয়। গাছকে সবল রাখতে গোড়ায় মাটি দিতে হয়। বীজ থেকে চারাগাছ যখন ২.৫ ফুট -৩ ফুট উচ্চতায় আসবে তখন তার মাথা কেটে দিতে হয়। এর ফলে পাশ থেকে প্রচুর ডাল বার হবে এবং ঝোপালো হবে। এতে অল্প উচ্চতায় বেশি সংখ্যায় ডাঁটা পাওয়া যাবে।

সারপ্রয়োগ :

বীজের চারা রোপণের তিন মাস পরে গাছপিছু ১০০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০০ গ্রাম সিঙ্গল সুপার ফসফেট এবং ৫০ গ্রাম মিউরিয়েট অব পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে। ডাল কেটে বংশবৃদ্ধি করা চারাগাছে পচা গোবর/ কেঁচো সার গাছপিছু পাঁচ কেজি করে দিলে উপকার পাওয়া যায়।

জলসেচ : শুকনো অবস্থায় / বৃষ্টি না হলে জলসেচ দিলে গাছের বৃদ্ধি ভালো হয়, ফল ভালো হয়।

ফসল তোলা :

চারা রোপণের চার মাসের মধ্যে গাছে ফুল আসা শুরু হয়, ছয় মাসের মাথায় ডাঁটা তোলার উপযুক্ত হয়। গাছপ্রতি গড়ে ২০০টি ডাঁটা পাওয়া যায়। ডাঁটা পেড়ে নেবার পরে মাটি থেকে ৩ ফুট উচ্চতায় গাছের মাথা ছেঁটে দিতে হয়। ৫-৬ মাস পরে গাছে আবার নতুন ডাল তৈরি হয়, ফুল ও ডাঁটা আবার পাওয়া যায়।

ডাল কেটে বংশবিস্তার করলে সজনেগাছ আগাছার মতো বেড়ে লম্বা হয়। ফলে বিশ্রী চেহারা ধারণ করে। লম্বা লম্বা ডালের ডগায় ডাঁটা ধরে। ডাঁটা পাড়া কষ্টকর হয়। তাই ডাঁটা পাড়ার জন্য ডাল কেটে নিতে হয়। অন্যান্য ডালও কেটে দিতে হয়। ফলে নতুন ডাল গজায়, তাতেই প্রচুর ফুল আসে এবং ফল ধরে। গাছে প্রথম দিকে ৮০-৯০টা ডাঁটা ধরে, বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সেটা বেড়ে ৫০০-১০০০টা পর্যন্ত ডাঁটা পাওয়া যায়।

রোগ ও পোকা নিয়ন্ত্রণ :

সজনেগাছে পোকার উপদ্রব বেশি। বেশ কয়েক ধরনের ল্যাদা পোকা/ক্যাটারপিলার সজনে গাছের সবুজ পাতা, ঝুরি খেয়ে নেয়।

প্রতিকার : এন্ডোসালফান ৩৫%প্রতি লিটার জলে ২ মিলি গুলে স্প্রে করতে হয়।

শুঁয়োপোকা : এরা সজনের প্রধান শত্রু। রাত্রে গাছের পাতা, কুঁড়ি ও ডাল খেয়ে দিনের বেলায় গাছের গুঁড়িতে জোট বেঁধে থাকে।

প্রতিকার : দিনের বেলায় এন্ডোসালফান ওষুধ গুলে স্প্রে করা অথবা আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে দেওয়া অথবা গাছের গুঁড়িতে জোট বেঁধে থাকা অবস্থায় বালতি/ মগে সাধারণত কম দামি ডিটারজেন্ট পাউডার (সার্ফ) গুলে শুঁয়োপোকার ঝাঁকে ঢেলে দিলে সব পোকা মারা যায়।

কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা : কাণ্ড ছিদ্র করে কুরে কুরে খায়। গাছ দুর্বল হয়। ডাল ভেঙে যায়। আঠা ঝরে।

প্রতিকার : কাণ্ডের গর্ত পরিষ্কার করে কেরোসিন/ পেট্রোল/তরল স্পর্শজনিত কীটনাশক যেমন — ডাইক্লোরভস, এন্ডোসালফান গর্তে ঢেলে গর্তের মুখ মাটি দিয়ে বন্ধ করে দিতে হয়।